টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

বীর প্রসবিনী ও স্বর্ণ প্রসবিনী টাঙ্গাইল। এই টাঙ্গাইল যুগ যুগান্তর ব্যাপী জন্ম দিয়েছে অনেক কৃতিবিদ, ধারণ করেছে অনন্য সমৃদ্ধিশালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভান্ডার। দেশের বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে বিশ্লেষিত করেছেন টাঙ্গাইলকে। কারণ ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ, কৃষক প্রজা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে রয়েছে এই অঞ্চলের সন্তানদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা।

যে কোনো ভালো, উল্লেখযোগ্য, ব্যতিক্রমধর্মী ও অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাব বা পুরস্কার প্রদানের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। খেতাব রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বা সরকারী পর্যায়ের হতে পারে আবার বেসরকারী পর্যায়েরও হতে পারে। জনগণের রায়ে এক ধরণের খেতাবের প্রচলন দেখা যায়, ঐতিহ্যগত ভাবে খেতাব প্রাপ্ত পদক ও রিবন পরিধানের মাধ্যমে নামের প্রথমে বা শেষে খেতাব উল্লেখ করে খেতাব প্রাপ্তির প্রমাণ দিয়ে থাকে। পদক প্রবর্তন হওয়ার আগে অন্য অনেক কিছুর মাধ্যমেও পুরস্কার বা খেতাবের স্বীকৃতি দেয়া হতো। এছাড়াও অতীত থেকেই খেতাব প্রাপ্তরা বিভিন্ন ধরণের সম্মান ও বৈষয়িক সুবিধা পেয়ে আসছে।

খেতাব বিভিন্ন কারণে প্রদান করা হয়। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহস বা বীরত্ব, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, সমাজসেবা, দেশ সেবা, সুশাসন ইত্যাদি যে কোনো ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য খেতাব বা পুরস্কার দেয়া হয়।১ মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য টাঙ্গাইল জেলার যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা খেতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের নিয়েই এই প্রবন্ধ।
টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনীর সদস্যদের বীরত্ব সূচক খেতাবের জন্য একটি তালিকা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি সদর দপ্তর এফ.জে সেক্টর, প্রযতেœ ৯৯এপিও (ভারতীয় সেনা বাহিনী) থেকে সদর দপ্তর বাংলাদেশ বাহিনীতে প্রেরণ করা হয়। পত্রে স্বাক্ষর করেন ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং। খেতাব প্রাপ্তের জন্য পত্রের সাথে কাদের বাহিনীর ১৩৪ জনের একটি তালিকা সংযুক্ত ছিলো। পত্রে উল্লেখ ছিলো যে, কাদের বাহিনীর এ সমস্ত সদস্যদের সুপারিশ নামায় কাদের সিদ্দিকী লিখবেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কাদের বাহিনীর সদস্যদের সুপারিশ নামা ৩০ জুলাই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত সুপারিশ নামা ফর্মের পরিবর্তে সাদা কাগজে বাংলায় হাতে লিখে পাঠানো হয়। কাদের বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ কাদের সিদ্দিকীসহ কয়েক জনের সুপারিশ নামায় ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং স্বাক্ষর করেন। বাকি সকলের সুপারিশ নামায় কাদের সিদ্দিকী স্বাক্ষর করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর ৬৭৬ জনকে বীরত্ব খেতাব প্রদান করেন। তাদের মধ্যে ৭ জনকে বীর শ্রেষ্ঠ। ৬৮ জনকে বীর উত্তম। ১৭৫ জনকে বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জনকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন। টাঙ্গাইল জেলায় কেউ কোন বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব পাননি। বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন একজন। তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন ৯ জন।

এই ৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা হলেন- ১. হাবিবুর রহমান হাবিব বীর বিক্রম, ২. আবদুস সবুর খান বীর বিক্রম, ৩. আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম, ৪. শহীদ সিপাহী খন্দকার রেজানুর হোসেন বীর বিক্রম, ৫. শহীদ মনিরুজ্জামান খান বীর বিক্রম, ৬. শহীদ আবদুর রকিব মিয়া বীর বিক্রম, ৭. মোহাম্মদ আবদুর রহমান আবিদ বীর বিক্রম, ৮. শহীদ লেফ্টেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম, ৯। আবদুস সালাম বীর বিক্রম।

বীর বিক্রমদের মধ্যে তিনজন কাদের বাহিনীর। এই তিনজন হলেন- হাবিবুর রহমান বীরবিক্রম, আব্দুস সবুর খান বীরবিক্রম ও আবুল কালাম আজাদ বীরবিক্রম। একজন খেতাব প্রাপ্ত বীরমুক্তিযোদ্ধা ই.পি.আর ছিলেন। তিনি হলেন- শহীদ মনিরুজ্জামান খান বীরবিক্রম। তিনি ই.পি.আরের সুবেদার ছিলেন। ৯ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করে খেতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। দুইজন নৌ-কমান্ডার ছিলেন টাঙ্গাইলের সন্তান। এরা হলেন- মোহাম্মদ আবদুর রহমান আবিদ বীরবিক্রম এবং শহীদ মোহাম্মদ আবদুর রকিব মিঞা বীরবিক্রম। এই দুইজন খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ১০ নম্বর সেক্টরের নৌ-কমান্ডার ছিলেন।

তাছাড়া শহীদ সিপাহী রেজানূর হোসেন বীরবিক্রম, শহীদ লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম বীরবিক্রম ও আব্দুস সালাম বীরবিক্রম সেনা সদস্য ছিলেন। টাঙ্গাইলের ৯ জন বীরবিক্রম মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে চারজন বীরমুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধ করে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশ মাতৃকার জন্য শহীদ হয়েছেন।

বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন ১৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা। এই ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা হলেন- ১। ফজলুল হক বীর প্রতীক, ২। আবদুল গফুর মিয়া বীর প্রতীক, ৩। ফয়েজুর রহমান ফুল বীর প্রতীক, ৪। মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার বীর প্রতীক, ৫। মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার বীর প্রতীক, ৬। মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক, ৭। খসরু মিয়া বীর প্রতীক, ৮। হামিদুল হক বীর প্রতীক, ৯. সৈয়দ গোলাম

মোস্তফা বীর প্রতীক, ১০। মোঃ শহীদুল ইসলাম শহীদ (লালু) বীর প্রতীক, ১১। শামছুল আলম বীর প্রতীক, ১২। মনিরুল ইসলাম লেবু বীর প্রতীক, ১৩। নায়েক সুবেদার মোঃ নাসির উদ্দিন বীর প্রতীক, ১৪। নায়েক সিরাজুল ইকসলাম বীর প্রতীক, ১৫। ল্যান্স-নায়েক আবদুর রহমান বীর প্রতীক, ১৬। মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বীর প্রতীক, ১৭। আরিফ আহমেদ দুলাল বীর প্রতীক,৪ ১৮। নবী নেওয়াজ খান, বীর প্রতীক,৫ ১৯। আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীক, ২০। আবদুল হাকিম বীর প্রতীক, ২১। আনিছুল ইসলাম আকন্দ বীর প্রতীক।
টাঙ্গাইলের খেতাব প্রাপ্ত বীর প্রতীকদের মধ্যে ১২ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন কাদের বাহিনীতে যুদ্ধ করে। এই বীর সন্তানেরা হলেন- (১) ফজলুল হক বীর প্রতীক, (২) আবদুল গফুর মিয়া বীর প্রতীক, (৩) ফয়েজুর রহমান ফুল বীর প্রতীক, (৪) মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার বীর প্রতীক, (৫) হাবিবুর রহমান তালুকদার বীর প্রতীক, (৬) মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক, (৭) খসরু মিয়া বীর প্রতীক, (৮) হামিদুল হক বীর প্রতীক, (৯) সৈয়দ গোলাম মোস্তফা বীর প্রতীক, (১০) মোঃ শহীদুল ইসলাম শহীদ ওরফে লালু বীর প্রতীক, (১১) আরিফ আহমেদ দুলাল বীর প্রতীক, (১২) নবী নেওয়াজ খান বীর প্রতীক। এছাড়া টাঙ্গাইল জেলার খেতাব প্রাপ্ত বীর প্রতীকদের মধ্যে ৫ জন বীর প্রতীক খেতাবধারী সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তারা বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধ করে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। এরা হলেন- (১) মনিরুল ইসলাম লেবু বীর প্রতীক, (২) শামসুল আলম বীর প্রতীক, (৩) নায়েক সুবেদার মোঃ নাসির উদ্দিন বীর প্রতীক, (৪) নায়েক সিরাজুল ইসলাম বীর প্রতীক, (৫) ল্যান্স নায়েক আবদুর রহমান বীর প্রতীক।

তাছাড়া আনিছুল ইসলাম আকন্দ বীর প্রতীক, আবদুল হাকিম বীর প্রতীক, মোঃ আব্দুল্লাহ্ বীর প্রতীক ও আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীকের বাড়ি টাঙ্গাইলে নয়। তারা টাঙ্গাইলে অস্থায়ী ভাবে থেকেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

তা ছাড়াও টাঙ্গাইলের আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম খেতাব প্রাপ্তদের তালিকার দৈনিক কাগজ গুলোতে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের গেজেটিয়ার ভূক্ত হননি। তবু বীর প্রতীক হিসাবে পরিচয় দেন- ১। মরহুম আবদুল বাসেত সিদ্দিকী, ২। কাজী আশরাফ হুমায়ুন বাঙ্গাল, ৩। ফেরদৌস আলম রঞ্জু, ৪। ফজলুর রহমান ফজলু, ৫। আলী আহম্মেদ, ৬। শহীদ জাহাঙ্গীর, ৭। আনোয়ার উল আলম শহীদ, ৮। আবদুল মালেক, ৯। আবদুর রাজ্জাক, ১০। মোঃ লুৎফর রহমান, ১১। আমজাদ হোসেন, ১২। মোকাদ্দেস আলী প্রমূখ।
টাঙ্গাইলের খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম ঃ ছাতিহাটি, কালিহাতি, টাঙ্গাইল। ডাক নাম বজ্র। তবে বাঘা সিদ্দিকী নামে সর্বাদিক পরিচিত। পিতা আবদুল আলী সিদ্দিকী। মাতা লতিফা সিদ্দিকী। সংগঠক, পরিচালক, মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক, রাজনীতিক, সমাজসেবী ও লেখক। শিক্ষা বি.এ অনার্স। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অভি স্মরণীয় অবদান রয়েছে। বাঙ্গালির স্বাধীনতার ইতিহাসে গবেষকেরা আবদুল কাদের সিদ্দিকীকে শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদা দেন। কাদের সিদ্দিকীর মত বাঙ্গালী বীর এর জন্ম টাঙ্গাইলে। বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সোপান আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনের জেলা পর্যায়ের নেতা ছিলেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ও ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টিসহ কয়েকটি স্বাধীনতার স্বপক্ষের দলের ও তাদের ছাত্র সংগঠনের সমর্থনে সারাদেশে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কাদের সিদ্দিকী এ সময়ে ছাত্র নেতা হিসেবে টাঙ্গাইলে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিতে জড়িত ছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের পিলখানায় তৎকালীন ই.পি.আর বর্তমান বি.ডি.আর এর বাঙ্গালী সদস্য, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাঙ্গালী পুলিশের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন হলে ও অন্যান্য স্থানে জনতার উপর অর্তকিত হামলা করে। এই ঘটনার পর টাঙ্গাইল ট্রেজারীর কিছু অস্ত্র ও গোলা-বারুদ কাদের সিদ্দিকীর হস্তগত হয়।

এই সব অস্ত্র গোলা-বারুদ দিয়ে কাদের সিদ্দিকী ছাত্র যুবক সমন্বয়ে একটি সশস্ত্র দল গঠন করেন। ২৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পাকিস্তানী বাহিনী তৎকালীন ঢাকা জেলা বর্তমান গাজীপুর জেলার ভাওয়াল রাজবাড়ির সেনানিবাসে বিমান হামলা চালায়। ঢাকা শহরে ও গাজীপুরে পাকিস্তানী বাহিনীর হামলায় ছত্র ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বেশ কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী সৈন্য ই.পি.আর পুলিশ টাঙ্গাইল ও মির্জাপুর এলাকায় সরে যান। ৩০ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ প্রথমে কাদের সিদ্দিকীর দলের ও ছাত্র জনতার প্রতিরোধে এবং পরে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ অন্যান্য নেতার মধ্যস্থতায় টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে অবস্থানরত বাঙ্গালী সৈন্যরা ছাত্র জনতার কাতারে সামিল হন। ৩ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইলের আওয়ামী লীগ নেতা সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃ বৃন্দের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী সৈন্য ই.পি.আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, কাদের সিদ্দিকীর দল এবং ছাত্র জনতা সমন্বয়ে গঠিত প্রতিরোধ বাহিনী ও পাকিস্তানী সৈন্যের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার গোড়ান সাটিয়াচরায় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তানী সৈন্যদের ভারী অস্ত্র ও গোলা-বারুদ এর মুখে প্রতিরোধ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল কাদের সিদ্দিকীর বড় ভাই আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ও সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতাদের প্রচেষ্টায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতিতে প্রতিরোধ বাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ন হয়। এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর দল অংশ গ্রহণ করেন।

এখানে ও পাকিস্তানী সৈন্যের হামলার মুখে প্রতিরোধ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কালিহাতি যুদ্ধের পর কাদের সিদ্দিকীর শুরু হয় নিঃসঙ্গ জীবন। আশ্রয়ের সন্ধানে তাকে টাঙ্গাইল জেলার গ্রাম থেকে গ্রামে ধর্না দিতে হয়। এর পর তিনি সাথী ও পরিচিতিদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের সংগে নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র গোলা-বারুদ সংগ্রহ এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ও পালিয়ে আসা বাঙ্গালী সৈন্য ই.পি.আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র যুবকদের তার দলে সংগঠিত করেন। অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শীদের নিয়ে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর ও বহেড়াতলীতে ছাত্র যুবকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেন। এই ভাবে টাঙ্গাইল জেলা এলাকার কাদের সিদ্দিকীর একটি বিশাল বাহিনী গড়ে উঠে। কাদের সিদ্দিকীর নামানুসারে এই বাহিনী কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত লাভ করে। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছিল সখিপুর। দ্বিতীয় কার্যালয় স্থাপন করেন ভূঞাপুর।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় টাঙ্গাইল জেলা ১১ নং সেক্টরের অধীন ছিল। কিশোরগঞ্জ মাহকুমাবাদে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল নিয়ে ১১ নং সেক্টর গঠিত হয়। ১১ নং সেক্টরের কোন স্থায়ী সদর দপ্তর ছিল না। যুদ্ধকালীন মেজর আবু তাহের নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ হামিদ উল্লাহ খান নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ পরিচালনা সুবিধার জন্য ১১ নং সেক্টরকে ৬ টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। মানকার চর, মহেন্দ্রগঞ্জ, পুরাখাসিয়া, ঢাল,ু রংরা, বাগমারা সাব সেক্টর ছিল। যুদ্ধকালীন লেফটেন্যান্ট আবদুল মান্নান, লেফটেন্যান্ট হাসমী, শামসুল আলম, মোস্তফা কামাল, লেফটেন্যান্ট সৈয়দ কামাল উদ্দিন, ক্যাপ্টেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, সাব-সেক্টর কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১০ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ কাদেরিয়া বাহিনীর একটি দল কোম্পানী কমা-ার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার মাটিকাটায় নদীতে পাকিস্তানী অস্ত্র ও গোলা-বারুদ বাহী ২ টি জাহাজ আক্রমণ করে দখল করেন। এই জাহাজের অনেক অস্ত্র ও প্রচুর পরিমাণ গোলা-বারুদ কাদের সিদ্দিকীর হস্তাগত হয়। ১৬ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার ধলাপাড়ায় পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মু ুখযুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী আহত হন। প্রথমে দেশের অভ্যন্তরে ও পরে ভারতে তাঁর চিকিৎসা হয়।

কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর বাহিনী অনেক দলে বিভক্ত হয়ে ময়মনসিংহ. টাঙ্গাইল, ঢাকা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের তাবেদার বাহিনী রাজাকার, আল শামস্, আল বদর বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা ও সম্মুখযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। বিদেশী পত্র পত্রিকায় কাদের সিদ্দিকীকে স্বঘোষিত জেনারেল আখ্যায়িত করা। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের জন্য আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত হন।

জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন চুড়ান্ত তালিকা তৈরি সংরক্ষিত হয়নি। এই কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সংখ্যা বলা কঠিন। অনেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধার আনুমানিক সংখ্যা তিন লক্ষের উপরে বা নিচে বলে থাকেন। বাংলাদেশের বর্তমান তালিকা ভূক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হচ্ছে ১৬৭৭০৮ জন। এর মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হচ্ছে ৮১৬২ জন। অনেকের মতে এই সংখ্যা দশ হাজারের মতো।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনকে ১১ টি ভাগে ভাগ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এই ১১ টি রণাঙ্গনের অধীনে যুদ্ধ করেন। তবে তখন কয়েক জন তেজী ও সাহসী ব্যক্তির ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও উদ্যোগে কয়েকটি ব্যক্তিগত বাহিনী বা দল গড়ে উঠে। এর মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনী সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ছিল। সতের হাজার মুক্তিযোদ্ধা তাঁর অধীনে যুদ্ধ করেন। তিনি সি.এন.সি'র মর্যাদা লাভ করেন। বাহাত্তর হাজার সেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রায় চল্লিশ হাজার দেশ প্রেমিক লোক তাকে সমর্থন দান করেন। বাংলাদেশের ভিতর থেকে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী তাদের নিজস্ব নিয়মে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরা সাড়ে তিনশ'র বেশি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং সহস্রাধিক পাকিস্তানী সৈন্য খতম করে। এ বাহিনীর নাম শোনা মাত্রই পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগিদের বুকে কাঁপন ধরত। প্রায় ১৫০০০ বর্গমাইল এলাকা কাদেরিয়া বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি মুক্ত এলাকায় ট্রেনিং ক্যাম্প এবং হাসপাতাল স্থাপন করেন। তিনি ভারতের মানকার চর গমন করেন এবং সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেন।

কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্দশে বিশ্বাসী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার গভর্নর নির্ধারিত হন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হন। তখন এর প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকী দেশ ত্যাগ করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাসাইল ও সখিপুর আসন থেকে এম.পি নির্বাচিত হন। বর্তমান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি।

মোঃ হাবিবুর রহমান বীর বিক্রম ঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ও সৈন্যের বর্বরোচিত হামলা, নির্যাতন, নির্বিচারে হত্যা, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ, ধন-সম্পদ লুটের প্রতিবাদে অনেক বাঙ্গালী সৈন্য পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে একজন মোঃ হাবিবুর রহমান।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ২য় ইস্ট বেঙ্গল হাবিলদার পদে চাকুরি করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে তৎকালীন যশোর জেলার ঝিনাইদহ কলেজ ইন্সটেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যশোর জেলার ঝিনাইদহ, মাগুরা, শৈলকুপা, বিষয়খালি ও কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাংগা মেহেরপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। মোঃ হাবিবুর রহমান কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে ঘাটাইলের রতনপুর নামক স্থানে দেখা করে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগদান করেন। ১১নং সেক্টরের অধীন টাঙ্গাইল জেলা এলাকায় কাদের সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিশাল বাহিনী গড়ে উঠে। কাদের সিদ্দিকীর নামানুসারে এই বাহিনী কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত লাভ করে। কাদের সিদ্দিকী কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান ছিলেন।

তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে ১১ নং সেক্টর গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মেজর আবু তাহের নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ হতে ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ হামিদ উল্লাহ খান নভেম্বর খ্রিস্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য তখন ১১ নং সেক্টরকে ৬ টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। মানকার চর, মহেন্দ্রগঞ্জ, পুরাখাসিয়া, ঢালু, রংরা, বাগমারা সাব সেক্টর ছিল। যুদ্ধকালীন লেফটেন্যান্ট আবদুল মান্নান, লেফটেন্যান্ট হাসমী, শামসুল আলম, মোস্তফা কামাল, লেঃ সৈয়দ কামাল উদ্দিন, ক্যাপ্টেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান সাব-সেক্টর কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ হাবিবুর রহমান কাদেরিয়া বাহিনীতে কোম্পানী কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। টাঙ্গাইল, রসুলপুর, ভূঞাপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, বানিয়াপাড়া, ধলাপাড়া, নাগরপুর, জার্মুকী, করটিয়া, মাটিকাটা, পালিমা, নাটিয়াপাড়া, কালিহাতীসহ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের তাবেদার বাহিনী রাজাকার, আল শামস, আল বদর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় সাহসিকতার পরিচয় দেন ও সুখ্যাতি অর্জন করেন।

১০ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার মাটিকাটায় (সিরাজকান্দী ঘাটে) ধলেশ্বরী নদীতে পাকিস্তানী সমরাস্ত্রবাহী ২ টি জাহাজ আক্রমণ করে দখল করেন। এই জাহাজে ২১ কোটি টাকার অস্ত্র গোলা-বারুদ ছিল। এখান থেকে ৭৭৫ নৌকা অস্ত্র, বারুদ মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে যায়। বাকী গোলা-বারুদ জাহাজে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখান থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান জাহাজ মারা হাবিব নামে পরিচিতি লাভ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ হাবিবুর রহমান এর দখলকৃত জাহাজের নাম ছিল এস.ইউ ইঞ্জিনিয়ার্স এল.সি-৩ ও এস.টি রাজন। এই দু'টি জাহাজের আগুন প্রায় দু'শ থেকে তিনশত ফুট পর্যন্ত উপরে ওঠা-নামা করছিল। আগুনের লেলিহান শিখা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত দেখা যাওয়ায় পাক হানাদারাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই সাফল্যে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ হস্তাগত হয় এবং অপর পক্ষে পাক বাহিনীর অপূরণীয় ও অভাবনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। মোঃ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এটাই সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ সফল যুদ্ধ এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার জন্য মোঃ হাবিবুর রহমান 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত হন।

মোঃ হাবিবুর রহমান টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার সাধুর গলগোন্ডা গ্রামে ১৮ অক্টোবর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী কছিম উদ্দিন। এই বীর ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রামের রাস্তায় স্ট্রোকাক্রান্ত হয়ে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যবরণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ হাবিবুর রহমান 'বীর বিক্রম' এর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম ঃ যুগে যুগে এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্ররাই অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছেন। সবচেয়ে বেশী তাদের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে এদেশের মাটি। বিভিন্ন সংগ্রামে ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশী অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছে। আবুল কালাম আজাদ তাদের মধ্যে একজন। আবুল কালাম আজাদ এর ডাক নাম কালাম। পিতা মৃত কাশেম উদ্দিন সরকার ওরফে আব্দুল মজিদ। মাতা সালেহা বেওয়া। তিনি টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার পারদিঘুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বি.এ পাস।

কালাম যখন টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার ব্রাহ্মণশ্শাশন মহাবিদ্যালয়ে এইচ.এস.সি পড়েন, তখন দেশে ৬ দফা ও ১১ দফার সংগ্রাম, পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। আবুল কালাম আজাদ এসব সংগ্রাম ও প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৯ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। যে এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনী গড়ে উঠেছিল এ এলাকাটি ছিল ১১ নং সেক্টর এর অধীন। আবুল কালাম আজাদ কমা-ার ছিলেন। টাঙ্গাইল শহরে অসংখ্য সম্মুখ যুদ্ধে ও গেরিলা হামলায় অংশ গ্রহণ করে প্রশংসনীয় সাহসিকতার পরিচয় দেন।

১৭ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার ভাতকুড়া নগর জলপাই গ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হয়ে ধরা পড়েন। তাঁর সাথী মুক্তিযোদ্ধা বাকু এ যুদ্ধে শহীদ হন। আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতারের পর পাকিস্তানী সৈন্যরা তাকে ঢাকা সেনানিবাসে এনে অমানুষিক অত্যাচার করে, রেডিও টিভিতে জোর করে স্বাক্ষাৎকার দেয়ায়। ২ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ স্পেশাল মার্শাল ল কোর্টে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয় এবং ১৫ বার বেত্রাঘাত করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে তিনি মুক্তি পান।

স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রশংসনীয় সাহসিকতার জন্য আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত হন। ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন, গীতিকার, সুরকার, কবি, মঞ্চ অভিনেতা, তবলা বাদক ও শিল্পী। স্বাধীনতা যুদ্ধে আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শহীদ সিপাহী খন্দকার রেজানুর হোসেন বীর বিক্রম ঃ শহীদ সিপাহী খন্দকার রেজানুর হোসেন বীর বিক্রম, পিতা মৃত কে এইচ হায়দার আলী, গ্রাম- পাচুরিয়া, ডাকঘর- লউহাটি, উপজেলা- দেলদুয়ার, জেলা- টাঙ্গাইল। তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দপুর ক্যান্টমেন্টের সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। বাংলাদেশের সরকার তার এই সাহসিকতার জন্য বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেন। শহীদ সিপাহী খন্দকার রেজানুর হোসেন বীর বিক্রম মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্ব পূর্ণ অবদানের জন্য চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শহীদ মনিরুজ্জামান খান বীর বিক্রম ঃ টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার বাথুলী সাদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আকমল খান। মাতার নাম আমেনা বেগম। মনিরুজ্জামান খান তৎকালীন ই.পি.আর এর সুবেদার পদে চাকুরি করতেন। বৃহত্তর কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গায় তার পোষ্টিং হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাদের ২৬ মার্চ তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ তিনি কুষ্টিয়ার শহরে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। ঐ দিন ২৫০ জন পাকসেনা নিহত হয়। এর পর ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জের বিশয়খালি পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনীর পতন হলে অন্যান্যদের সাথে মনিরুজ্জামান খান ভারত চলে যান। পরবর্তীতে তিনি ৮ নং সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। মেজর আবু ওসমান তার সেক্টর কমা-ার ছিলেন। তিনি নিজে একজন কোম্পানী কমা-ার ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন যশোরের কাশীপুরে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার জন্য শহীদ মনিরুজ্জামান খান বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মনিরুজ্জামান খান বীর বিক্রম এর অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান আবিদ বীর বিক্রম- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমা-ারদের মধ্যে যে কয়েক জন নৌ কমা-ার সাহসিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহাম্মদ আবদুর রহমান আবিদ বীর বিক্রম। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর নাগরপুর উপজেলার সলিমবাদ ইউনিয়নের সলিমবাদ (তে-বাড়িয়া) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শফিকুর রহমান ওরফে সাহেদ আলী খান, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া লেখা করেছেন।

নৌ বাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে কর্ম জীবনের শুরু। চাকুরিব্রত অবস্থায় ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তুলোন ও ব্রেস্ট সাব-মেরিন পোর্টে এক বৎসর ছয় মাস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। একই বৎসর ২৯ এপ্রিল ভারত চলে আসেন। ভারতে স্বল্প কালিন প্রশিক্ষণ শেষে ভিসা থাকায় জেনেভা হয়ে মাদ্রী গমন করেন। পরবর্তীতে আবার ভারতের সিটিজেন পেয়ে হযরত নিজাম উদ্দিন রোডস্থ একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং কমা-ার প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় নৌ বাহিনীদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পাক-বাহিনীকে খতম করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা ভাগীরথী নদী, পলাশীর যুদ্ধের স্থানে সি, ২ পি সাংকেতিক নামে একটি নৌ কমা-ার ক্যাম্প গড়ে তোলেন এবং এটাই একমাত্র আত্মঘাতি বাহিনী হিসেবে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন। মোহাম্মদ আবদুর রহমান আবিদ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে রয়েছে বিরাট অবদান। এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেছেন।মোহাম্মদ আবদুর রহমান আবিদ বীর বিক্রম এর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শহীদ লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম ঃ শহীদ লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার বানিয়ারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম খন্দকার নূরুল ইসলাম। মাতার নাম সালেহা খাতুন। তিনি

কুমিল্লার কসবাতে চন্দ্রপুর গ্রামে স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্মুখ সমরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর ভোর রাত্রিতে ১১ জন সহযোদ্ধা সৈনিকসহ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদৎ বরণ করেন।

শহীদ লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলামের এই বীরত্ব সূচক সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেছেন। শহীদ লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম এর স্বাধীনতা যুদ্ধের অবদানের জন্য অমর হয়ে থাকবে।

শহীদ মোহাম্মদ আবদুর রকিব মিঞা বীর বিক্রম ঃ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্থল বাহিনীর পর পরই নৌ পথে যারা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শণ করেছেন তাঁরা ছিলেন নৌ-কমা-োর। তাঁরা পৃথক বাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। সমগ্র বাংলাদেশের নৌ-চলাচল, বন্দর এবং উপকূলীয় এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল ১০ নম্বর সেক্টর। তবে অন্যান্য সেক্টরের মতো এই সেক্টরের জন্য নির্দিষ্ট কোন সেক্টর কমা-োর ছিলো না। বিভিন্ন সেক্টরের সেক্টর কমা-োরগণ স্ব-স্ব এলাকার সংশ্লিষ্ট উপকূল, বন্দর এবং নৌ চলাচলে এই সব কমা-োরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতেন। তবে নৌ কমা-োররা তাদের অধীন ছিলেন না। তাঁরা মুজিব নগর হেড কোয়াটারের সরাসরি নির্দেশে দায়িত্ব পালন করতেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দর, চাঁদপুর, দাউদকান্দি, নারায়নগঞ্জ, আশুগঞ্জ, নগরবাড়ি, খুলনা, বরিশাল, গোয়ালন্দ, ফুলছড়ি, আরিচা ঘাট, বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যা নদী ইত্যাদির ওপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে বাণিজ্য এবং হানাদার বাহিনীর চলাচলকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেয়া হয় 'অপারেশন জ্যাকপট'।

উল্লেখিত কমা-ো অভিযান পরিচালনার জন্য পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগিরথী নদীর তীরে একটি গোপন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। এই ক্যাম্পের সাংকেতিক নাম দেয়া হয়েছিল সি. ২. পি। বাংলাদেশের নিপুন সাতারু এবং স্বাস্থ্যবান বাছাই করা যুবকগণ শত্রু জাহাজ ধ্বংসের জন্য কমা-ো হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান ছিল এই গোপন ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্দেশ্য। ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে এই ক্যাম্পের তত্ত্বাবধান এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম ব্যাচে মোট ১৫০ জন যুবককে বাছাই করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত তখন ফ্রান্সের তুলন শহরে ডুবো জাহাজ (সাব-মেরিন) পরিচালনার জন্য পাকিস্তানি নৌ-বাহিনীর মোট ৪১ জন সাবমেরিনার এই ট্রেনিং দিচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন্য ছিলেন বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী সাবমেরিনারগণের মধ্যে থেকে ৮ জন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের অন্যতম হলেন মোহাম্মদ আবদুর রকিব মিঞা বীর বিক্রম। তিনি ভাগিরথীর তীরে সংগঠিত কমা-ো প্রশিক্ষণে যোগ দিয়ে ছিলেন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে নৌ-বিধ্বংসী কমা-ো অপারেশনে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাকিস্তানী নেভীর বাঙ্গালী সাবমেরিনার মোহাম্মদ আবদুর রকিব মিঞা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ ৮ জন বাঙ্গালী সাবমেরিনারে একটি দলসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। দূভার্গ্য বশতঃ তিনি একটি নৌ-কামা-ো অভিযানে চলন্ত জাহাজে মাইন লাগাতে গিয়া প্রপেলারের আঘাতে প্রাণ হারান। এই বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হন।

শহীদ মোহাম্মদ আবদুর রকিব মিঞা বীর বিক্রম টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের শোলা প্রতিমা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী হাতেম আলী। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।১৩
আবদুস সবুর খান বীর বিক্রম ঃ টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যে কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম আবদুস সবুর খান।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ থানার চর রাগোব রায় গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর সেবাশ্রয়ে যৌবনের অধিকাংশ কর্মময় সময় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আবদুস সবুর খান বঙ্গবীর আবদুল কদের সিদ্দিকীর নিদের্শে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরেন। সতেরো হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং বাহাত্তর হাজার স্বেচ্ছা সেবকদের সমন্বয়ে যে বিশেষ বাহিনী স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে সে দলেরই উজ্বল নক্ষত্র হিসেবে বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম আবদুস সবুর খানকে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আসন পেতে দিয়ে ছিলেন।

আবদুস সবুর খান টাঙ্গাইলের সার্কিট হাউসের অস্ত্র ছিনতাইসহ টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহের যুদ্ধে এবং অস্ত্র সংগ্রহে বীরত্বপূর্ণ অভিযানে সাহসিক ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি গোড়ান সাটিয়ার যুদ্ধ, বল্লার যুদ্ধ, চারানের যুদ্ধ, নাটিয়া পাড়ার যুদ্ধ, কামুটিয়ার যুদ্ধ, দেওপাড়ার যুদ্ধ ও এলাসীনের যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকীর ভাষায় "চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান নিয়ে সবুর হানাদারদের উপর যেভাবে নিরন্তর গুলি বর্ষণ করছিল তা শুধু বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেই নয়, যে কোন যুদ্ধের ইতিহাসেরই এক বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা"। আবদুস সবুর খান স্বাধীনতার যুদ্ধে বিশেষ ভাবে অবদান রাখার জন্য বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত হন।

তিনি একজন শ্রমিক নেতা। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি দীর্ঘ দিন হতে জড়িত রয়েছেন। সহজ, সরল, বিনয়ী, পরিশ্রমী, ধর্মপ্রাণ ও উদার হৃদয়ের আবদুস সবুর খান বীর বিক্রম আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বাধীনতা যুদ্ধে আবদুস সবুর খান বীর বিক্রম এর অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ ফজলুল হক বীর প্রতীক ঃ মোঃ ফজলুল হক এর ডাক নাম ফজলু। তিনি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দীঘলকান্দি ইউনিয়ন অর্ন্তগত উপলদীয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলানা মোঃ ওসমান গনি। মাতা লাইলী বেগম।

মোঃ ফজলুল হক টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া সা'দত কলেজের আই.এ প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের সমর্থক ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।

২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। ১১নং সেক্টরের অধীন কাদেরিয়া বাহিনীতে কোম্পানী কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন স্থানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা, পিংনা, বকশীগঞ্জ, রংপুর জেলার রৌমারী, ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ, পাকুটিয়া, ঘিত্তর, সাটুরিয়া, সাভার, কালিয়াকৈর, মিরপুর ও বৃহত্তর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ, চৌহালীতে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেয়।

১৪ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার মাটিকাটায় পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য মোঃ ফজলুল হক বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

মোঃ ফজলুল হক এর যুদ্ধের সময়কার স্মরণীয় ঘটনা টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার মাটিকাটায় যুদ্ধের ২য় দিনে পাকিস্তানীরা বিমান হামলা করে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মোঃ ফজলুল হক একা পড়ে যান। সেখান থেকে গভীর রাতে একা হাঁটতে হাঁটতে ভূঞাপুর এসে কমা-ার হাবিবুর রহমানের সংগে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা ছয় সাত জন মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হন। এখান থেকে কোথায় যাবেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের মধ্যে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র জমা দিয়ে পায়খানা করতে যান। অনেকক্ষণ পরও তারা ফিরে আসেনি। হঠাৎ করে কয়েকজন রাজাকার এসে তাদের দিকে গুলি বর্ষণ শুরু করে। তারা সংখ্যায় কম থাকায় রাজাকার এর হাতে ধরা পড়ার আশংকায় পালটা জবাব না দিয়ে কোন ক্রমে অস্ত্র গুলি নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন এবং পুনরায় মাটিকাটায় ফিরে যান। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ ফজলুল হক বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (আওয়ামী লীগ সমর্থিত) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জেলা পর্যায়ে কমা-ারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আবদুল গফুর মিয়া বীর প্রতীক ঃ আবদুল গফুর মিয়া টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার কাউলজানী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মোঃ গজনবী মিয়া, মাতা মোছাঃ বাদশা বেগম। তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। একজন সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ও সৈন্যের নির্যাতন বর্বরোচিত হামলা বাড়ি ঘর অগ্নি সংযোগ, নির্বিচারে হত্যা, নারী ধর্ষণ ও ধন সম্পদ লুটের ঘটনায় অনেক বাঙালী সৈন্য চাকুরি জীবনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে একজন আবদুল গফুর মিয়া। আবদুল গফুর মিয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন।

২৫ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর। ১১নং সেক্টরের কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। আবদুল গফুর মিয়া কাদেরিয়া বহিনীতে কোম্পানী কমা-ার ছিলেন। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর, কালিহাতী, দেওপাড়া, বল্লা বাজার, ধলাপাড়া, টাঙ্গাইল, এলেঙ্গা, গোপালপুর, সখিপুর, ময়মনসিংহের ফুল বাড়িয়ায় পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখে যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর যুদ্ধে সু-খ্যাতি অর্জন করেন।

১৫ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ফুল বাড়িয়ায় পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

আবদুল গফুর মিয়ার যুদ্ধের সময়কার স্মরণীয় ঘটনা। আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানী গোলা-বারুদ বাহী জাহাজ উত্তর বঙ্গের দিকে যাবার সময় টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর যমুনা নদীতে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে ধবংস করে দেয়। এ সময়ে পাকিস্তানী জুঙ্গী বিমান মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলা চালায় এতে আবদুল গফুর মিয়া কোন ক্রমে জীবনে বেঁচে যান। কৈশোরে ফুটবল খেলায় আবদুল গফুর মিয়া পারদর্শী ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে আবদুল গফুর মিয়া বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফয়েজুর রহমান ফুল বীর প্রতীক ঃ ফয়েজুর রহমান ফুল আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের সমর্থক ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন। ফয়েজুর রহমানের ডাক নাম ফুল। টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার দিঘুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম হাজী মনসুর রহমান। মাতা মরহুমা মাহফুজান নেছা। ফয়েজুর রহমান বি.এ পাস।

৩ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ১১ নং সেক্টরের কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিশোরগঞ্জ বাদে বৃহত্তর ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল জেলা ১১ নং সেক্টরের অধীন ছিল। ১১ নং সেক্টরে কাদেরিয়া বাহিনী নামে এক বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠে। ফয়েজুর রহমান কাদেরিয়া বাহিনীতে থেকে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। হাবিবুর রহমান তাঁর গ্রুপ কমা-ার ছিলেন।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানায় পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে ফয়েজুর রহমান আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য ফয়েজুর রহমান ফুল বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে ফয়েজুর রহমান ফুল বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার বীর প্রতীক ঃ মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার বীর ঘাটাইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম মনির উদ্দিন তালুকদার। মাতা মরহুমা কুলছুম বেগম। তিনি এস.এস. সি পাস।
মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।

১৯ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ভারতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষ করে ১১ নং সেক্টরে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগদেন। মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার কাদেরিয়া বাহিনীতে একজন কোম্পানী কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খোরশেদ আলম তালুকদার ও তাঁর কোম্পানীর অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা টাঙ্গাইল এলাকার বিভিন্ন যুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন।
১৪ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার গর্জনা গ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ খোরশেদ আলম তালুকদার বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশ স্বাধীনের পর হতে ৪২ কলেজ পাড়া, থানা পাড়া রোড, থানা সদর টাঙ্গাইলে বসবাস করছেন।

মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার বীর প্রতীক ঃ হাবিবুর রহমান তালুকদারের ডাক নাম খোকা। পিতা মরহুম মোবারক আলী তালুকদার। মাতা মাছুদা বেগম। টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার টেংগুরিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া সা'দত কলেজে বি.এ পরীক্ষার্থী ছিলেন। ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১১ নং সেক্টরে কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার কাদেরিয়া বাহিনীতে থেকে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে অসংখ্য গেরিলা হামলা ও সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। তাঁর কোম্পানী কমা-ার ছিলেন সুবেদার সোহরাব আলী খান। ১২ জুন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার কামুটিয়া নামক স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে শেলের টুকরায় আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক ঃ ছাত্র জীবন একটি অমূল্য জীবন। যে জীবনে নিজে শিক্ষা লাভ করা যায়। দেশ বা জাতির জন্য অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে থাকা যায়। এমনি সুযোগ বাঙ্গালী ছাত্রদের জীবনে অনেক বার এসেছে। তারা বাংলা ভাষা আন্দোলন, গণ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন, প্রতিরোধ যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধে ও গণতন্ত্র উত্তরনের আন্দোলনে অবদান রেখে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। মোঃ সাইদুর রহমান ও এমনি একজন ছাত্র যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

এদেশের বাঙ্গালী ছাত্র, জনতা, শ্রমিক বিভিন্ন পেশার মানুষ যখন আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত তখন করটিয়া সা'দত কলেজে এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী মোঃ সাইদুর রহমান ১১ দফা ও ৬ দফা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন।

২৯ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তখন তার বয়স ১৮ বছর। ১১ নং সেক্টরের অধীন থেকে কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। ২৭ নং হিরু কোম্পানীতে ছিলেন। নিজে গ্রুপ কমা-ার। কাদেরিয়া বাহিনীতে তাঁর অস্ত্র প্রশিক্ষণ হয়।

বৃহত্তর ময়নসিংহ জেলা টাঙ্গাইল জেলা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে ১১ নং সেক্টরের অধীন ছিল। মোঃ সাইদুর রহমান কাদেরিয়া বাহিনীতে থেকে টাঙ্গাইল জেলার চারান, বল্লা, দেও পাড়া, ধলাপাড়া, অর্জুনা, ভূঞাপুর, বাথুলী ঘাটা, করটিয়া, নাইটাপাড়া, মির্জাপুর, গোড়াই, নাগরপুর, এলাসিন ও জামালপুর জেলার বেওলীতে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১২ জুন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার বল্লা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার কামার্থী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সিরাজুল ইসলাম, মাতা-মরহুমা বসিরন নেছা। তিনি বি.এ পাস।

মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক এর যুদ্ধের সময়কার স্মরণীয় ঘটনা, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার এলাসিন যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত এবং এ যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হওয়া। এদিন যুদ্ধে মোঃ সাইদুর রহমান এর সাথী মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সবুর পাকিস্তানী সৈন্য মনে করে তার উপর অনুমান ১০ গজ দূর থেকে চাইনিজ হালকা মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় একটি গুলিও মোঃ সাইদুর রহমানের গায়ে লাগেনি। তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক কাবাডি, ভলিবল, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন খেলায় পারদর্শী। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ সাইদুর রহমান বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

খসরু মিঞা বীর প্রতীক ঃ খসরু মিঞার ডাক নাম খসরু। পিতা মরহুম রুকুনুদ্দিন মিঞা। মাতা মোসাম্মত খ্যাতিমন। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার রতনপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এস.এস.সি পাস।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আনসারদের স্মরণীয় অবদান আছে। তারা অনেকেই পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ছিল। তাদের মধ্যে একজন খসরু মিঞা।

১ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তখন তার বয়স ২৫ বছর। ১১ নং সেক্টরে কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমাবাদে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে ১১ নং সেক্টর গঠন করা হয়। যুদ্ধকালীন মেজর আবু তাহের নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১ নং সেক্টরের কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কাদেরিয়া বাহিনীর খোরশেদ আলম তালুকদার খসরু মিঞার কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন। নিজে গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন। খসরু মিঞা টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর, ভূঞাপুর, শয়া পালিমা, ধলাপাড়া, বানিয়াপাড়া, পাবনা জেলার নগর বাড়িতে পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের তাবেদার বাহিনী রাজাকার, আল-শামস, আল-বদর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ৭ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার শয়া পালিমা যুদ্ধে সুখ্যাতি অর্জন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য খসরু মিঞা বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯ নভেম্বর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ তিনি পরলোক গমন করেন। স্বধীনতা যুদ্ধে খসরু মিঞা বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ নাসির উদ্দিন বীর প্রতীক ঃ মোঃ নাসির উদ্দিন টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার মামুদ নগর ইউনিয়নের আন্দিবাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নায়েক সুবেদার পদে চাকুরি করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি চাকুরী বাদ দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। নায়েক সুবেদার মোঃ নাসির উদ্দিন বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এই বীরত্বপূর্ণ সাহসী অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন।

শহীদুল ইসলাম শহীদ বীর প্রতীক ঃ দেশের সর্ব কণিষ্ঠ বীর প্রতীক শহীদুল ইসলাম শহীদ ওরফে লালু (মুক্তি যুদ্ধকালীন নাম)। লালু শৈশবে দূরন্ত প্রকৃতির ছিল। যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ১৩ বছর।

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানা সূতি পলাশ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হেলাল উদ্দিন। গোপালপুরে পাকবাহিনীর ভয়ে অন্যদের মতো তিনিও গ্রাম বাসীর সাথে গোপালপুর পৌর শহর থেকে দূরে নিজ থানার কেরামজানী গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীক ও কাজী আশরাফ হুমায়ুন বাঙ্গালের সান্নিধ্য পান। তাদের ফুট ফরমাশ করতে গিয়ে অস্ত্র চালনার আবদার করেন। পরে ভারতের তুরা পাহাড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বয়সে ছোট থাকায় রাইফেলের জায়গায় স্ট্রেনগান দেয়া হয় তাঁকে। পাশাপাশি গ্রেনেড ছোড়ার ট্রেনিং গ্রহণ করেন। গোপালপুর থানা অভিযানে সেই কৃতিত্বের চুড়ান্ত প্রয়োগ করেন। গোপালপুর থানায় পাকসেনাদের বাংকার গ্রেনেডের উড়িয়ে দিয়ে সেই সময়ের ক্ষুদে কিশোর গেরিলা শহীদুল ইসলাম লালু কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন। সেই বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার জন্য তৎকালীন সরকার তাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

শীহদুল ইসলাম লালুকে দায়িত্ব দেয়া হায়েছিল গোপালপুর থানায় পাকসেনাদের বাংকার গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। বয়সে ছোট বলে সবার অলক্ষ্যে এ কাজ সহজে করা যাবে এবং ক্যাম্পের ভেতরে সহজে ঢুকতে পারবে। শত্রুবলে সন্দেহও করবে না কেউ। সে জন্য লালুকে দায়িত্ব দেয়া হয়। নির্ধারিত দিনে হাফ প্যান্ট পরা লালু গ্রেনেড নিয়ে গোপালপুর থানার দিকে রওয়ানা দেন। পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়। থানার গেটের সামনের বট গাছের নীচে এলেই লালুর গ্রামের দূর স¤পর্কের এক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। সে তখন রাজাকারদের নিয়ে রাস্তা পাহারায় ছিল। শহীদুল ইসলাম লালুকে দেখেই সে আঞ্চলিক ভাষায় জিজ্ঞাস করে, “কিরে শহীদুল? এতদিন কোনে আছিলি?” কোথায় এত দিন ছিলি লালুর সেই সত্যি কথাটা বলা মোটেও ঠিক নয়। তাই একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে লালু বলে; “কোনে আর যামু যে দিকে যাই খালি গোলা গুলি। আমার ডর করে। নানী গো বাড়ীতে যামু।”

“কোনে আর যাবি। আমাগো ক্যাম্পেই থাইকা যা, ঐ বাংকারে পাঞ্জাবী সেনা গো চা টা খাওয়াবি”।

কৌশলে জবাব দিয়ে লালু ক্যাম্পে ঢোকার বন্দোবস্ত করে নেয়। এমন একটা সুযোগের সহজ প্রাপ্তিই ভাবতে পারেনি লালু। এভাবেই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ গুলি সহজে সমাধান হয়ে যায়। আর যা হবার নয় তা শত সুযোগের মাঝেও সমাধান হয় না। আর যা হবার তা এমনি ভাবেই তৈরি হয়।

থানার ভেতরে ঢুকে লালু পরিত্যক্ত এক ঘরে সকলের অগোচরে গ্রেনেড গুলো রেখে আসে সুযোগ বুঝে ব্যবহার করার জন্য। চা পানি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চারি দিকে দেখে নেয় কে কোথায় কি অবস্থায় আছে। তিনটি বাংকার তার টাগেট হয়। যা সে সহজেই উড়িয়ে দিতে পারবে। তবে তাতে কত জনকে ঘায়েল করা যাবে তার হিসেবও সে কষে নেন। কৌশলে জেনে নেন একেকটি বাংকারে পাঁচ জন, চার জন, তিন জন এই ভাবে ভারী অস্ত্র নিয়ে পজিশন নিয়ে আছে। ছোট হবার সুবাদে সকলের সন্দেহের বাইরে থেকে লালু তার অভিষ্ঠ লক্ষে পৌঁছায়।

সব ঠিক-ঠাক করে গ্রেনেড গুলো আনার জন্য পরিত্যক্ত সেই ঘরে যখন লালু ঢুকে গ্রেনেডের উপর হাত রাখে তখন ঘটে আরেক বীভৎস বিপদ। হাতে কেমন যেন ঠান্ডা অনুভব করল শহীদুল ইসলাম লালু। গ্রেনেডের উপর শুয়ে আছে মস্ত এক ধোরা সাপ। অন্য কোন জাতের সাপ হলে ততক্ষণে কামড়ে দিত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই বেঁচে যাওয়া। লালু গ্রামের ছেলে তাই তার অভিজ্ঞতা ও সাহস বেশি। কৌশলে খুব দ্রুত গ্রেনেড গুলো সরিয়ে নেন। প্রতিটি বাংকারের কাছে গিয়ে গ্রেনেডের সেফটিপিন খুলে দ্রুত প্রত্যেক বাংকারে ছুঁড়ে মারেন। লালুর ছুঁড়ে মারা গ্রেনেড গুলো প্রচ- বিস্ফোরিত হয়। প্রতিটি বাংকারের প্রায় সকলেই প্রাণ হারায়। সেই দিনই মুক্তিযোদ্ধারা গোপালপুর থানা সহজেই দখল করেন। সে সময় মুক্তি বাহিনীর দল আশ পাশের কোন এক গোপন জায়গায় ঘাপটি মেরে আছে সেই কথা লালুর জানা ছিল। তাই তাঁর মনে আরো নির্ভয় কাজ করেন। চারদিকে এলোপাথারি গুলি ছুটতে থাকে। বুকের উপর হেঁটে থানার পেছন দিক দিয়ে শহীদুল ইসলাম লালু কোন রকমে জীবন মৃত্যুর খেলায় জিতে গিয়ে রচনা করে মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য ইতিহাস।

সেই দিন লালু ফিরে আসতে পারবে সে ধারণা তাঁর কমা-ারদেরও ছিল না। সৌভাগ্য ক্রমে বেঁচে গিয়ে আজ জীবন এবং জীবিকার মাঝে আরেক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন শহীদুল ইসলাম লালু। এই অপারেশনের সাহসীকতার জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। এইটি তার স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা।

২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ যখন কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল বিন্দু বাসিনী স্কুলে বঙ্গবন্ধুর নিকট সকল মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিচ্ছিল, তখন লালুও তাঁর স্ট্রেনগানটি বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন। অবাক হয়ে বঙ্গবন্ধু পিঠ চাপড়ে বলেন- “সাবাস বাংলার ছেলে”। যখন গ্রেনেড মেরে বাংকার ধ্বংসের কথা শুনেন তখন বঙ্গবন্ধু আদর করে লালুকে কোলে তুলে নেন। সেই ছবি দিয়ে একটি পোষ্টার ও পরবর্তীতে ছাপা হয়েছে। শেখ রাসেল ও সেদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে এসেছিল। লালু সে দিনের কথা ভুলতে পারেন না। শেখ রাসেলও তিনি এক সাথে বসেছিল মঞ্চে। এই দৃশ্য বাঘা বাঙ্গালী ছায়া ছবিতে দেখানো হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদুল ইসলাম বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মনিরুল ইসলাম লেবু বীর প্রতীক ঃ টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল থানার কামুটিয়া গ্রামে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সাহেব আলী, মাতা লাইলি বেগম। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে করটিয়া এইচ.এম ইনষ্টিটিউশন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষে লাহোরের খেমকারান সেক্টরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নায়েক পদে উন্নতি হন। মার্চ মাসে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি লাহোর থেকে পালিয়ে খালেদ মোশারফ এর নেতৃতাধীন দুই নম্বর সেক্টরে মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করেন। কুমিল্লা অঞ্চলের বিভিন্ন যুদ্ধে মনিরুল ইসলাম লেবু অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। তাঁর ঐ সাহসিকতার জন্য স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন।

তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন্ট অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে মনিরুল ইসলাম লেবু এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ হামিদুল হক বীর প্রতীক ঃ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁদের অবদান স্মরণীয় তাঁদেরই একজন মোঃ হামিদুল হক। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর থানার কচুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ হাবিল উদ্দিন এবং মাতার নাম মোছাম্মৎ ফজিলাতুন্নেছা। বি.এ পাস। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর সহকারী বে-সরকারী প্রধান হিসেবে সক্রিয় ভাবে দেশ মাতাকে মুক্ত করার মহৎ লক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করে। উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করেন। বল্লা ও কামুটিয়ার সম্মুখ যুদ্ধে অসিম সাহসিকতার জন্য মোঃ হামিদুল হক এই খেতাব প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি আবার শিক্ষকতায় আত্ম নিয়োগ করেন।

এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। তিনি কাদের নগর মুজিব ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মোঃ হামিদুল হক ছাত্র জীবন থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সখিপুর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বর্তমানে মোঃ হামিদুল হক বীর প্রতীক বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কেন্দ্রী কমিটি সম্মানিত সদস্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ হামিদুল হক বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শামসুল আলম বীর প্রতীক ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাহসী ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে এমন একজন সাহসী সন্তান শামসুল আলম। তিনি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার কালিয়া গ্রামে ১ জানুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আজিজুর রহমান। মাতা রাইমা খাতুন। ম্যাটিকুলেশন পাস।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে কর্ম জীবনের শুরু। স্বল্পকাল পূর্ব পাকিস্তানে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর ক্যান্টনমেন্টে ১০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরি জনিত কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান কালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বদলী হয়ে ঢাকায় আসেন। সুদীর্ঘ কাল চাকুরি জীবনে অনেক সাহসি ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নৈপূণ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সেকেন্ড লেফ্টেন্যান্ট ছিলেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জনাব শামসুল আলম ও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যরা আগরতলা শালদা নদী সেক্টরে চলে যান। সেখানে পাকবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকবাহিনীকে পরাভূত করে শালদা নদীর স্থান দখল করে নেন। পরে ২নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁকে আদেশ দেন হিন্দুস্থান সৈন্যদের সাথে ভৈরব ব্রীজ এবং শুভাপুর ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য। তিনি ব্রীজদ্বয় ধ্বংসের সময় ইন্ডিয়ান সৈন্যদের নেতৃত্বদেন। সেই সুবাধে তাঁর নেতৃত্বে শুভাপুর এবং ভৈরব ব্রীজের ক্ষতি সাধন হয়। ব্রীজ ধ্বংসের কারণ হলো যাতে করে ট্রেন চলাচল করতে না পারে। এই ব্রীজ ধ্বংসে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন। শামসুল আলম এর এই সাহসিকতার জন্য বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে শামসুল আলম বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আবদুল হাকিম বীর প্রতীক ঃ আবদুল হাকিম জয়দেবপুর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হাবিলদার পদে চাকুরি করতেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ১১ নং সেক্টরের অধীনে কাদেরিয়া বাহিনীতে যুদ্ধ করেন। আবদুল হাকিম কাদেরিয়া বাহিনীতে কোম্পানী কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

টাঙ্গাইল জেলার দেওপাড়া, ধলাপাড়া, সাগর দীঘি, ইছাপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, ভূঞাপুর, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার দুলভিটিতে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার ইছাপুর গোরস্থানে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আবদুল হাকিম এর অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। আবদুল হাকিম বীর প্রতীক জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার মেদুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাছুম আলী। মাতার নাম মরতোজান নেছা। তিনি এস.এস.সি পাস। স্বাধীনতা যুদ্ধে আবদুল হাকিম বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ আবদুল্লাহ বীর প্রতীক ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বর্বরোচিত হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে অনেক বাঙালি যুবক হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। তাদেরই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুল্লাহ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন। ১১ নং সেক্টরের অধীনে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগদেন। কাদেরিয়া বাহিনী থেকে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা ব্রীজে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর সেই যুদ্ধে মোঃ আবদুল্লাহ আহত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর সাহসিকতার জন্য তিনি বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

মোঃ আবদুল্লাহ বীর প্রতীক ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার তামাইট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাদের মিঞা। মাতার নাম মোছাম্মৎ নূরজাহান। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ আবদুল্লাহ বীর প্রতীক এর অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীক ঃ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্যাগী ছাত্র শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী। আওয়ামী লীগের ৬ দফা থেকে শুরু করে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জড়িত ছিলেন। ভারতের তুরা থেকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ১১ নং সেক্টরের অধীনে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগদেন। শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বিভিন্ন সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানায় পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীক সিরাজগঞ্জ জেলার থানা সদরের ধানগড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রমজান আলী শেখ। মাতার নাম মোছাম্মৎ খায়রুন নেসা। তিনি বি.এ পাস। স্বাধীনতা যুদ্ধে শেখ মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ীর অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোঃ আনিছুল হক আকন্দ বীর প্রতীক ঃ মোঃ আনিছুল হক আকন্দ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিলেন। টাঙ্গাইল জেলার বাশহাটী হাইস্কুলে পড়তেন। আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের সমর্থক ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।

২৯ এপিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। ভারতের লোহার বনে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অস্ত্র প্রশিক্ষণ শেষ করে ১১ নং সেক্টরে যোগদান করেন। নিজে কোম্পানী কমা-ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সিলেট জেলার সমশের নগর বারমারী ময়মনসিংহ জেলার ধানুয়া কামালপুর বকসীগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ শহর ও ঢাকা মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের তাবেদার বাহিনী রাজাকার, আল শামস, আল বদর বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার পরিচয় দেন।

২ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ বকশীগঞ্জ থানার ধানুয়া কামালপুরে পাকিস্তানী সৈন্যের সেলের টুকরায় আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য মোঃ আনিছুল হক আকন্দ বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন।

মোঃ আনিছুল হক আকন্দ বীর প্রতীক এর ডাক নাম সঞ্জু। পিতা আবদুল আজিজ আকন্দ। মাতা মোছাঃ নেয়ামতজান। তিনি টাঙ্গাইল জেলার সংলগ্ন নান্দাইল থানার লংপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এইচ.এস.সি পাস। মোঃ আনিছুল হক আকন্দ বীর প্রতীক বর্তমানে গাজীপুর জেলার টুংগীতে মুন্নু টেক্সটাইল মিলে নিরাপত্তা পরিদর্শক হিসেবে চাকুরি করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে মোঃ আনিছুল হক আকন্দ বীর প্রতীক এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপরোক্ত টাঙ্গাইল জেলার খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা বাঙ্গালী জাতি চিরদিন স্মরণে রাখবেন।